১০৭
দৈনিক [illegible]
তারিখ ··· 24 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

মেধা পাচার

এখন যা স্বাভাবিক প্রয়োজন তাকেই অস্বাভাবিক করে তোলা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

এমন কি কোনো কথা আছে যে, বিদেশে না-গেলে স্বদেশকে চেনা হয় না? না, নেই। দেশে থেকেও স্বদেশকে চেনা যায়, হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। সে-ভাবে চিনেছে অনেকে, যুগ-যুগান্ত ধরে। তবে বিদেশে গেলে সাহায্য হয় চিনতে, অবশ্য যদি ইচ্ছা থাকে চিনবার। একটা নিরিখ পাওয়া যায়, এক ধরনের মানদণ্ড। অতীতে পর্যটকরা ওই সুবিধাকে কাজে লাগিয়েছেন, এখনও লাগান। অনেক আগে নয়, এই তো সেদিন অন্নদা শঙ্কর রায় লিখেছেন 'পথে-প্রবাসে' বইতে যে বিলেতে গিয়ে বাংলার নদ-নদীকে চিনেছেন তিনি, এক নিমেষে; বাংলার মানুষ, টেমসকে নদী বলি কি করে, বলেছেন তিনি। তারও বেশ পরে, পঞ্চাশের দশকে মুহম্মদ আব্দুল হাই বিলেত দেখেছেন সাড়ে শ' দিনের প্রবাসে, যত দেখেছেন তত চিনেছেন দেশকে, দুঃখ তারাক্রান্তে লিখেছেন তিনি সে-কথা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে।

বিদেশে গিয়ে বহু মানুষ দেশপ্রেমিক হয়ে ফিরেছেন। রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন তাঁরা, যেমন সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধী, জিন্নাহ, নেহেরু, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, সুভাস বসু—উজ্জ্বল নাম সব। এমএন রায়—জ্যোতি বসুরা কমিউনিস্ট হয়ে এলেন বিদেশে গিয়ে। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় বড় বিজ্ঞানী হয়েছেন, বিলেত গিয়ে—এবং সেই সঙ্গে গভীর জাতীয়তাবাদী। মাইকেল মধুসূদন তো সাহেব হতেই গিয়েছিলেন প্রভুর দেশে। বাঙালী হয়ে পড়লেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনেও বিলেতের প্রভাবকে খাটো করে যে দেখব সে-উপায় নেই।

এঁদের ছিল এক রকমের যাওয়া; একে মেধা-পাচার বলেনি কেউ, কারণ ছিল না বলবার। মেধা-পাচার ঘটছে এখন, স্বাধীনতার এই যুগে, পরাধীনতার কালে সেটা ঘটেনি। অকল্পনীয় ছিল ঘটা। ওরা টানতো ঠিকই; কিন্তু আমরা এতটা ঠেলতাম না। মেধা-পাচার ঘটছে এখন। শত শত ছেলে গেছে চলে, যাচ্ছে সমানে। মেয়েরাও যাচ্ছে চলে। যখন পারে। যায় বেশি, ফেরে কম। অনেকে ফেরেই না। ফিরলেও মাথা ভরতি বিদেশ থাকে, স্বদেশের পরিবর্তে। খাপ খায় না। মনে করে এখানকার পরিবেশ থাকার মতো নয়। থাকে এখানে তারাই, যাদের অন্য কোন উপায় নেই, মেধায় এবং যোগ্যতায় যারা বড় জোর দ্বিতীয় শ্রেণীর। দেশে যার বাড়ির দরজায় তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো, চালক সমেত, সে ছেলে হয়তো নিউইয়র্কে গিয়ে ট্যাক্সি চালায়; কিন্তু তবু ফিরবে না, অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে উজ্জ্বল, চঞ্চল জীবনযাত্রায়; বিবিধ পণ্যে, আমোদ-প্রমোদে, স্বদেশে যা টাকা থাকলেও কেনা যাবে না। বাবা-মা'য়ের স্বপ্ন ও সাধনা দিয়ে তৈরি বাড়িঘর বড় সামান্য মনে হয়, যেন গ্রামের কুঁড়ে ঘর। সেগুলো আকর্ষণ করে না। বাবা-মা'কেই যেতে হয়, ঘুরে আসেন, বাড়ি ও জমি ভাগাভাগি হয়ে যায়, হাত পড়ে প্রপার্টি ডেভেলপারদের টেনে-ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে দেয় তারা, একতলা বাড়ি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো বিলীন হয়ে যায়। লক লক করে উঠে যায় বহুতলা এপার্টমেন্ট।

অহরহ ঘটছে এটা। জাহাজ ডুববে মনে করলে যাত্রীরা যেমন মরিয়া হয়ে ওঠে ওই যান পরিত্যাগে, তেমনি ব্যস্ততা বিদেশে যাবার। অথবা যেন যুদ্ধ লেগেছে, দলে দলে সীমান্ত পার হচ্ছে শরণার্থী। শরণার্থীরা তবু ফিরে আসে। ওরা আসে না।

২.

ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে পড়তে। চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, পেশাজীবী যাচ্ছেন চাকরি করতে। শ্রমজীবীরাও যায়, কিন্তু তাকে আমরা মেধা পাচার বলি না। একে তো তাদের মেধাই নেই। তাতে আবার তারা ফিরে আসবে, অবশ্যই; যাচ্ছে তারা অর্থোপার্জনে, যাচ্ছে না পাচার হয়ে।

মেধা-পাচার পুঁজি পাচারই, এক ধরনের। দুই অর্থে। এক, মেধা পুঁজি আমাদের জন্য; যে কোনো দেশের জন্যই বটে, আমাদের জন্য বেশী করে। কেননা মেধার বড় ঘাটতি এখানে; জনতা আছে, জনসম্পদ নেই, মেধার অভাবে। দ্বিতীয়ত, স্থূল অর্থে মেধা হচ্ছে টাকা। মেধা তৈরির পেছনে টাকা খাটে, টাকা- না থাকলে পুষ্টি নেই। পুষ্টি না থাকলে মেধা নেই। বিদেশে যারা মেধা নিয়ে যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মেধার জোরের চেয়ে টাকার জোর অধিক, এবং সেই জোরেই যেতে পারে, নইলে যাবার কথা ভাবতোই না।

অবশ্যই বলা যাবে যে, এ এক আশ্চর্য ঘটনা যে, আমরা যখন পুঁজির জন্য হন্যে হয়ে উঠেছি, ধর্ণা দিচ্ছি বিদেশীদের কাছে, বলছি. এসো. চমৎকার সুযোগ আছে এখানে বিনিয়োগের, তখন নিজেরাই পুঁজি যা আছে তার একাংশ পাচার করে দিচ্ছি বিদেশে।

কিন্তু আসলে ঘটনাটি মোটেই বিস্ময়ের নয়। পুঁজির অভাব এবং পুঁজি পাচার—একই বৃন্তের দু'টি ফুল। গরীব দেশের বড় লোকেরাই বেশী বিলাসী হয়, ধনী দেশের বড় লোকদের তুলনায়। তারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নয়, ফাঁক-ফোকরে, হয়তো লুটপাট করেই বড় লোক হয়েছে; টাকা নিয়ে আর কি করবে, বিলাসে ব্যয় করে। ছেলেমেয়েদেরকে বিদেশে পাঠানো বিলাসেরই অংশ। আরো কারণ এই যে, অর্থনীতি যেখানে পিছিয়ে পড়া, বিদেশ নির্ভরতা সেখানে অপরিহার্য। রাষ্ট্র ছোটে বিদেশীদের কাছে, রাষ্ট্রের নাগরিকরা ছুটবে না কেন? বিনিয়োগ নেই বলেই পুঁজি পাচার হয়, মেধাও যায় পাচার হয়ে।

টাকা মানেই পুঁজি নয়, সব মেধাও মেধা নয়। অনেকেই মেধাবী অবস্থায় যায় না, ওখানে গিয়ে, পরিশ্রমের কারণে, ব্যবস্থায় পড়ে মেধাবী হয়ে ওঠে। বড় একটা অংশ যায় হারিয়ে। আজেবাজে কাজ করে, পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। মিশে যায় জনস্রোতে।

বাবা-মা' কি ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়ে খুশি? মনে হয় খুবই খুশি। যেন হাসি আর ধরে না, আসলে কিন্তু সবাই তা নয় অধিকাংশই স্বীকার করেন না। এমনকি নিজের কাছেও নয়, ভয় পান; কিন্তু জানেন তাঁরা যে তাতে সন্তুষ্ট নন। দুঃখ থাকে পাঠিয়ে। মনে হয় নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। আহা, ঠেলে দিলেন নিজের হাতে। বিদেশে পাঠানো ব্যাপারটা নতুন নয়। এ তো আগেও ছিল। গ্রামের ছেলে শহরে আসতো বৈকি। বাবা-মা'ই পাঠাতেন, কিন্তু সেটা ছিল যুদ্ধে পাঠানো, ছেলেটা যুদ্ধ করবে, প্রতিষ্ঠিত হবে। ফিরে আসবে। এই ছিল আশা। কিন্তু এখনকার পাঠানোটা যুদ্ধে নয়। নির্বাসনে। ধরেই নেয়া হয় যে, সে আসবে না। আসতে চাইলেও উপায় থাকবে না তার ফিরবার। গ্রাম থেকে আসতো যে যুবক সে গ্রামে ফিরে যেতো না, ঠিকই। কিন্তু তবু থাকতো দেশেই। এখনকার মেধাবানরা দেশে থাকবে না। গ্রামের ছেলে গ্রামে ফিরে না-যাবার প্রধান কারণ তার শ্রেণী-উত্তরণ ঘটতো, নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে পরিণত হতো সে পুরোপুরি মধ্যবিত্তে। বিলেতে যারা যেত তাদের ক্ষেত্রে এই শ্রেণী ত্যাগটা ঘটতো না। তারা যে শ্রেণী অবস্থান থেকে যেতো বিলেতে, সেই শ্রেণীতে থাকার জন্যই আসতো ফিরে। এখন যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও ব্যাপার ওই একই, শ্রেণী-উত্তরণ ঘটবে না, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই গেছে তারা, সেখানেই থাকবে, ফিরুক কি না—ফিরুক। যা ঘটছে এবং ঘটবে তা হচ্ছে ভিন্ন একটা সংস্কৃতি তাকে গ্রাস করে নেবে। চ্যুতি বলি কি উত্তরণ বলি, ব্যাপারটা সাংস্কৃতিক। সংস্কৃতি যাকে গিলে ফেলে শ্রেণী তাকে বাঁচাতে পারে না। দেখি আমরা। দেখছি।

কেন পাঠায় বাবা-মা, এই নির্বাসনে? পাঠিয়ে দিয়ে প্রথমে বিষণ্ণ, পরে উদ্বিগ্ন হয়। জানে ওরা তো ফিরবেই না, এই যে বাড়ি-ঘর, বাবা-মা তৈরি করেছেন, এতো কষ্ট করে, এতো আশা নিয়ে, এসবও যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে। কবরে পরিণত হবে সবকিছুর—আশার, স্বপ্নের, সাধনার। তা কবরস্থানেও লোক যায়, ফুল রেখে আসে, দাঁড়িয়ে দোয়া করে। সেটা করারও লোক পাওয়া যাবে না। যারা পারতো করতে তারা তো বিদেশে।

তাহলে কেন পাঠায়? পাঠানো সহজ নয়। টাকা লাগে। এবং টাকার জন্য সৎ-অসৎ সব পথে টাকা দিতে হয়। আগের প্রজন্ম টাকা-পয়সা কিছুই রেখে যাননি, বিষয়-সম্পত্তি তো ছিলই না। এক প্রজন্মের সামান্য সময়ে সবটা গড়ে তুলতে হয়েছে। দ্রুত। নোংরা হয়েছে হাত, মনে যে গ্লানি জমেনি তাও নয়। তারপর সেই টাকা দিয়ে ছেলেটাকে নির্বাসনে পাঠালেন। দৌড়াদৌড়ি করলেন এ—অফিসে ও—অফিসে। যাতে সে যেতে পারে। এখন চিঠি লিখতে হয় তাকে নিয়মিত। ফোন না করলে চলে না। যেতেও হয়, কেমন আছে দেখতে। কেন এসব ঝক্কি ঝামেলা, কষ্ট, গ্লানি? পরিণামে হতাশা? পাঠাতে হয়, কেননা না পাঠিয়ে উপায় নেই। ব্যক্তি যে আসলেই কত অসহায় এক্ষেত্রে বোঝা যায়। ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেই আয়োজন করতে হয় ছেলেটিকে পাঠাবার। অন্যরা সবাই যাচ্ছে, আমি কেন যাব না—ছেলেটি জিজ্ঞাসা করতে থাকে, নীরবে, সর্বদা, সরবেও কখনো কখনো। এই প্রশ্নের অন্য জবাব নেই। জবাব দিতে হয় পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পাচারে যদি অক্ষমতা ঘটে. তবে ধিক্কার ধ্বনিতে অস্থির হতে হয়। প্রতিবেশী, পরিচিত, আত্মীয়স্বজন সবাই ধিক্কার দেয়। দেয় গৃহিণী। সন্তানরা তো অবশ্যই। বাবা ছোটেন ব্যাংকে, টাকাকে ডলারে পরিণত করার লক্ষ্যে। ছেলে ছোটে দূতাবাসে, ভিসার সন্ধানে।

এ ছাড়া এটাও তো সত্য যে, দেশে উচ্চ শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা নেই। যা ছিল তাও ভেঙ্গে পড়ছে। দেখা দিয়েছে সন্ত্রাস, অনিবার্য হয়ে পড়েছে শেসন জট। এখানে ছেলেটিকে রাখা মানে আশঙ্কা জিইয়ে রাখা যে, সে জড়িয়ে পড়বে সন্ত্রাসে এবং অবশ্যই আটকা পড়বে সেশন জটে। শিক্ষা কবে শেষ হবে কে জানে, তার আগে প্রাণই যেতে পারে চলে। মেয়েরা পড়ে থাকে। তাদের রাখতে হয়, কেননা উপায় হয়নি এখনও তাদেরকে সহজে পাঠাবার। কিন্তু ছেলেকে ধরে রাখা যাবে কোন্ আশায়। তা ছাড়া শিক্ষার মানও তো গিয়েছে অধঃপাতে। পড়ালেখা হয় বাংলা মাধ্যমে। যা পড়া হয় তা উঁচু মানের নয়। এ শিক্ষা নিয়ে ছেলেটি দাঁড়াতে পারবে কী? এমনিতেই চাকরি নেই, দেশী ডিগ্রী আগামীতে চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন হবে। সব কিছুই বাধ্য করে ছেলেটিকে বিদেশে পাঠাতে।

ওদিকে যত পাঠাচ্ছি আমরা তরুণদেরকে বিদেশে তত খারাপ হচ্ছে দেশের অবস্থা। শ্রমজীবীদের যাওয়াটা আলাদা ব্যাপার। তারা যায় টাকা আয় করতে, আয় করে টাকা দেশে পাঠায়। শিক্ষার্থীরা যায় টাকা ব্যয় করতে। সবটাই খরচ তাদের ক্ষেত্রে। পেশাজীবী যারা যায়, তারা আয় করে বটে কিন্তু যা তাদের আয় তার প্রায় সবটাই খরচ হয় বিদেশি। শ্রমজীবীদের নিতে বিদেশীদের আগ্রহ কম। শিক্ষার্থীদের তারা নেয়, কেননা জানে তাতে টাকা আসবে। দেশের টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশে। আর সেই টাকারও ব্যবস্থা করার আবশ্যকতায় দুর্নীতি বাড়ছে দেশে। দুর্নীতির পথে সংগ্রহ করা টাকা যে পুঁজিতে পরিণত হবে এবং বিনিয়োগ হবে শিল্পকারখানায় তার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে, এমনকি দালান-কোঠাও তো তৈরি হতে পারতো ওই টাকায়, মন্দের ভালো হতো সেটুকু; তাও ঘটছে না। সবটাই বিদেশে পাচার।

সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, যেহেতু ধনবানদের ছেলেরা এখন আর দেশে পড়ে না—তাই দেশী শিক্ষা ব্যবস্থায় গোল্লায় গেলেও মাথাব্যথা করবে এমন লোক তেমন দেখা যায় না। ধনবানই ক্ষমতাবান, সমাজে ও রাষ্ট্রে তারাই প্রতিষ্ঠিত, তাদের সন্তানরা যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ে না সেগুলোর ভবিষ্যত অন্ধকার হতে বাধ্য, অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মেই। তরুণরা যত বেশী পরিমাণে বিদেশে যাচ্ছে তত অধিক মাত্রায় ক্ষতি হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার।

আর যেটা একেবারেই অকল্পনীয় ছিল আমাদের দেশের জন্য সেটাও ঘটছে। এবং আগামীতে ঘটবে আরো বেশী করে। সেটা হলো ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা। আমাদের সংবিধানে বিধান আছে, এখনও আছে যে দেশে একটি অভিন্ন ও সর্বজনীন শিক্ষা রীতি চালু থাকবে। আমাদের সংবিধানকে নানা অংশে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে, প্রকাশ্যে; তার শিক্ষা সংক্রান্ত অংশটি আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও সংশোধন করা হয়নি। সেই বিচারে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক কাজ চলছে শিক্ষা ক্ষেত্রে, যেখানে এখন একটি নয়, তিন তিনটি ধারা চালু হয়েছে। গরীব যায় মাদ্রাসায়, মধ্যবিত্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধনী ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে। এর পরে প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলে পড়ার দরুন ধনী ঘরের ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা করলেও বাংলা মাধ্যমের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবে না, তাদেরকে যেতে হবে হয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে, নয়তো বিদেশে। গোড়া শক্ত করে তোলা হচ্ছে, গোড়া থেকেই।

৩.

ওই যে শুরুতে আমরা আগের দিনের কথা বলেছি, যখন ছেলেরা বিদেশে যেতো এবং দেশপ্রেমিক হয়ে ফিরে আসতো, ওই ঘটনার কারণটা কি ছিল? আর এখনই বা তেমনটা ঘটছে না কেন? কারণটা এক দিক দিয়ে কৌতুকের। সেটি এই যে, তখন দেশ ছিল পরাধীন, এখন দেশ স্বাধীন; পরাধীন দেশের তরুণরা ফিরতো স্বাধীন হয়ে, আর স্বাধীন দেশের তরুণরা বিদেশে গিয়ে এতটাই পরাধীন হয়ে পড়ে যে দেশপ্রেমিক হবে কি, বিদেশেই থেকে যায় এবং ওই পরাধীনতাকেই মনে করে স্বাধীনতা।

ইংরেজ আমলে দেশটা যে পরাধীন ছিল এটা না বোঝবার কোনো কারণ ছিল না। পদে পদে, দেখে দেখে, ঘা খেয়ে খেয়ে জানতে হতো পরাধীনতার নিষ্ঠুর সত্যটাকে। দেশ এখন স্থূল অর্থে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মোটেই তা হয়নি। এখনকার তরুণরা মনে করে তারা স্বাধীন, কিন্তু জানে না যে তাদের দেশ স্বাধীন নয়। কেননা দেশ আত্মসমর্পণ করে বসে আছে বিদেশীদের কাছে। ওই আত্মসমর্পণেই স্বাধীনতা রয়েছে—দেশের তরুণরা পড়েছে এই মস্ত বড় বিভ্রমে। মহোৎসাহে তারা আত্মসমর্পণ করছে বিদেশী সংস্কৃতির কাছে এবং ওই পরাধীনতাকেই আঁকড়ে ধরছে স্বাধীনতা বলে। মস্তক ধোলাই আর কাকে বলে। সেকালে বিদেশে গেলে অনেকেই সমাজতন্ত্রী হয়ে ফিরতো, যুগটাই ছিল ওই রকমের, এখন হাওয়া একদিকেই, তরুণরা সবাই একদিকেই চলে—পুঁজিবাদের দিকে।

আমরা খপ্পরে পড়েছি এখন নতুন দাসত্বের। সেটি বাজার অর্থনীতির। আমাদের ছেলেরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বিদেশে, আগের দিনের ক্রীতদাসদের মতো। প্রাচীন দাস-ব্যবস্থাকে চেনা যেত, এই নতুন ব্যবস্থাকে চেনা যায় না। কিন্তু ক্রন্দন আছে, নীরব ক্রন্দন। বাবা-মা কাঁদেন, ছেলেমেয়েরা যে কাঁদে না তাও নয়, তারাও আর যাই পাক সম্মান পায় না; আদর নেই, অভাব বোধ করে উষ্ণ সান্নিধ্যের।

৪.

যারা গেছে তারা গেছেই। আরো বহুজন প্রস্তুত হচ্ছে ঘরে ঘরে; যাবে বলে। তাদেরকে রাখা যাবে কি ধরে?

রাখা যাবে, যদি পরিবর্তন হয় ব্যবস্থার। পরিবর্তনটা দেশেই ঘটতে হবে, বিদেশে নয়। যেমন একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রের ভিতরেই তৈরি হয় তেমনি করে আমাদের দেশের মেধা বিদেশে পাচার হবে কি হবে না তাও নির্ধারিত হবে দেশের ভিতরেই, বাইরে নয়। দেশের অবস্থা যত খারাপ হবে, বিদেশ যাবার উন্মাদনা বাড়বে তত অধিক পরিমাণে। মনে হবে পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিত্যক্তরাই শুধু থাকবে, এবং আক্ষেপ করবে যেতে পারছে না বলে। বিদেশে যাওয়া খারাপ নয়, প্রয়োজনেই বটে, কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে ধনী ঘরের ছেলেমেয়েরা যাবে চলে, কারণ হচ্ছে ঈর্ষার, স্বদেশে যারা বন্দী তাদের এবং ফিরবে না কখনো—এ নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য নয়। কে ভেবেছিল কবে যে এমনটি ঘটবে স্বাধীন বাংলাদেশে।

দেশের অবস্থার পরিবর্তন নানা কারণেই প্রয়োজন। মেধা-পাচার বন্ধ করার জন্যও বটে। পরিবর্তনের এই কাজটা একলা একলা সম্ভব করে এমন সাধ্য কারো নেই। করতে হবে সমবেতভাবেই। ব্যক্তি অনেকের সঙ্গে মিশে তবেই বদলাতে পারে ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থা বদলালে তার ফল ব্যক্তিও পাবে। এখন যা অবস্থা তাতে বিদেশে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, দেশে পড়ে থাকাটাই বরং অস্বাভাবিক। প্রয়োজন হবে এই অস্বাভাবিককে স্বাভাবিকে পরিণত করা, তাহলে দেখা যাবে ওই যে এখন যা স্বাভাবিক—অর্থাৎ মেধা-পাচার তা অস্বাভাবিক ঠেকছে। যারা বিদেশে গেছে, থাকবে সেখানেই, তাদেরকে টানাটানি করে লাভ নেই। তারা আসবে ফিরে যদি অবস্থা বদলায়, নইলে নয়।

ইতিমধ্যে তারা যাতে মানসিকভাবে, অর্থাৎ সাংস্কৃতিকভাবে, স্বাভাবিক থাকে এ ব্যাপারে বরঞ্চ আমরা সাহায্য করতে পারি। এক্ষেত্রে পরামর্শ দেবার সুযোগ রয়েছে। পরামর্শটা হচ্ছে বাঙালী হবার। সঙ্কটটা সাংস্কৃতিক, সমাধানটাকেও সাংস্কৃতিকই হতে হবে। কেউ কেউ ভাবেন ধর্মের দিকে যাবার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন। ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার, সংস্কৃতির নয়। ও পথে তাই অনেক দূর যে যাওয়া যাবে সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। সংস্কৃতি চর্চার প্রশস্ততম ও সবচেয়ে প্রসারিত পথ হচ্ছে ভাষা। প্রবাসী বাঙালী তরুণ-তরুণী যাতে বাংলা ভাষার চর্চা করে তার জন্য আয়োজন, পরামর্শ সব কিছুই করা ও দেয়া আবশ্যক। তারা চিঠি লিখুক বাংলায়, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলুক মাতৃ ভাষায়, বই পড়ুক, পত্রিকা রাখুক, গান শুনুক—সব কিছুই বাংলায়। কাজটা তেমন বড় নয়, কিন্তু খুবই জরুরী। এভাবেই চেষ্টা করা সম্ভব তাদেরকে স্বাভাবিক রাখা, অর্থাৎ নির্বাসনটাকে চূড়ান্ত না—করা।

কিন্তু বড় কাজটা থাকবে। সেটা হলো দেশকে প্রকৃত অর্থেই উন্নত করা। সব দিক দিয়ে। মেধা পাচারের সমস্যাটা ওই কথাই বলছে— খুব জোর গলায়।